Interview details

Interview with Shan Bhattacharya

Interviewed by Disha Raychaudhuri

দিশা : তুমি বাড়ির কারুর থেকে পূর্ব বাংলা নিয়ে কোনো গল্প শুনেছ বড় হবার সময়? যদি শুনে থাকো তাহলে সেগুলো একটু শেয়ার কর আমাদের সাথে। আমি কিছু ইন্টারাপ্ট করবনা এখন, জাস্ট লিখতে থাকব কয়েকটা জিনিস।

শান : আমার মানে ঠাকুরদা এবং ঠাকুমা দুজনেই পূর্ব বাংলার লোক। তো আমার ঠাকুরদার জন্ম হয়েছিল শোলধন বলে একটা গ্রামে তো সেটা ঢাকা জেলার মধ্যে পরে। আর আমার ঠাকুমার জন্ম হয়েছিল কাউলজানি গ্রামে সেটা আগে মইমনসিং-এর আন্ডারেই ছিল তবে এখন শুনেছি ওটা টাঙ্গাইল নতুন ডিস্ট্রিক্ট হয়ে যাবার পরে ওটা টাঙ্গাইল ডিসট্রিক্টের মধ্যে পড়ছে। তো এমনিতে পূর্ব বাংলার গল্প বলতে আমার ঠাকুমা মানে, পার্টিশানের সময় আমার ঠাকুমার বয়স ছিল ১২, যখন ওনারা চলে আসেন। আর আমার ঠাকুরদার তখন বয়স অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি, তো আমার ঠাকুরদা যে অ্যাকচুয়ালি পার্টিশান এর কারণেই এসছিলেন সবকিছু তাদের জমি জমা ছেড়ে দিয়ে, পুরো ফ্যামিলিকে ডিসপ্লেসড হয়ে এখানে চলে আসতে হয়েছিল, ব্যাপারটা সেরকম ছিল না। আমার ঠাকুরদার ফ্যামিলি ইন রিয়্যালি পার্টিশানের পরেও শোলধনেই রয়ে গেছিলেন। কিন্তু আমার ঠাকুমার ফ্যামিলিকে অ্যাকচুয়ালি পার্টিশানের জন্যই ওখান থেকে ডিসপ্লেসড হয়ে চলে আসতে হয়েছিল। তো সেটা নিয়ে একটা গল্প আমি ছোটবেলাতেও শুনেছি, তারপর পরবর্তীকালেও যখন আমি আমার এই কাজটা করছিলাম আরেকবার আমার ঠাকুমা আমাকে ওই গল্পগুলো বলেছিলেন, যে অ্যাপারেন্টলি যখন পার্টিশানের খবর গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে গেল আর কি তখন কাউলজানি গ্রামের কাছে বাসাইল বলে একটা জায়গা ছিল তো সেইখানে হিন্দু মুসলিম একটা কনফ্লিক্ট হয়েছিল তো তাতে অনেক বাড়ি ঘরে আগুন-টাগুন ধরিয়ে

দেওয়া হয়েছিল আর কিছু বোধয় খুন-টুনও হয়েছিল, মানে সেটা উনি ভালো বলতে পারেননি। বাট সেই খবর পেয়ে আমার ঠাকুমার বাবা, আমার ঠাকুমার বাবা ছিলেন ওখানকার লোকাল মাদ্রাসার হেডমাস্টার। মানে হিন্দু ফ্যামিলির হওয়া সত্ত্বেও উনি মাদ্রাসার হেডমাস্টার ছিলেন তো এবং আশেপাশে যারা মুসলিম ফ্যামিলি যারা ছিল আর কি তো তারা আমার ঠাকুমার বাবাকে ওনাকে আশ্বাস দিয়েছিল যে না চক্রবর্তী মশাই আপনি যাবেন না, আমরা থাকতে আপনার কোনো ভয় টয় নেই। কিন্তু এই বাসাইলের গন্ডগোলের খবর পেয়ে উনি আর ভরসা না করতে পেরে মাঝরাত্তির বেলা আমার যেহেতু বাড়িতে কম বয়সি মেয়ে প্রচুর ছিল প্লাস আমার ঠাকুমার ফ্যামিলি হাউস যেটা ছিল সেটা একটা পাকা বাড়ি ছিল। গ্রামে ওই চত্বরে আর কারুর পাকা বাড়ি ছিলনা। তো এই সমস্ত দিকে ভয় পেয়ে উনি ঠিক করলেন যে ফ্যামিলি শুদ্ধু পুরো ভারতবর্ষের দিকে, মানে কলকাতার দিকে চলে আসবেন। তো সেই সময় পাকিস্তান থেকে মানে যে তখন ওই জায়গাটা অলরেডি পাকিস্তান, তো পাকিস্তান থেকে এখানে ফাইণ্ড করতে গিয়ে ওনাদের তিন বার আর কি ট্রান্সপোর্ট চেঞ্জ করতে হয়েছিল। প্রথমে আমার ঠাকুমা আর ঠাকুমার মা এবং ওনাদের বাড়িতে অন্যান্য মেয়ে যারা ছিলেন, তাদেরকে পাল্কিতে করে বাসাইল অব্দি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেখান থেকে একটা ঘোড়ার গাড়িতে করে টাঙ্গাইল সিটি অব্দি ওনারা এসছিলেন রাত্তিরবেলা। তারপর পরেরদিন সকালবেলা ট্রেনে করে, সেই ট্রেনের মধ্যে নাকি, আমার ঠাকুমা গল্প বলেছেন, যে ঠাকুমাকে জানলার মধ্যে দিয়ে ট্রেনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল এত ভিড় ছিল এটসেটরা এটসেটরা। তো তারপরে সেই ট্রেন এসে আল্টিমেটলি কলকাতা এসে পৌঁছয়। ইতিমধ্যে আমার ঠাকুমার বড়দা যিনি ছিলেন, আমার বড় দাদু, উনি অলরেডি কলকাতায় চাকরি করতেন। তো কলকাতায় ওনার একটা থাকার বন্দোবস্ত ছিল তো প্রথমে দু এক রাত্রি ওই কলকাতার মেসেই সমস্ত ফ্যামিলি এসে উঠেছিল। তারপরে ওখান থেকে বাসে করে ওনারা হাবড়াতে চলে যান এবং হাবড়াতে ঐসময় একটা অ্যাপারেন্টলি একটা এক্সচেঞ্জ সিস্টেম কিছু হচ্ছিল যে হাবড়ার, হাবড়া গ্রামের কিছু মুসলিম ফ্যামিলি তারা চলে যাচ্ছিলেন বর্ডার পেরিয়ে পাকিস্তানে এবং তারা তাদের যে জমিজমাগুলো, সেইগুলো যাতে বর্ডারের ওপাশ থেকে হিন্দুরা এসে ঐখানটায় থাকতে পারে এরকম

একটা ব্যবস্থা করা ছিল। তো যেহেতু আমার ঠাকুমার বয়স ১২ ছিল তো অ্যাকচুয়ালি কতটা এই এক্সচেঞ্জটা কতটা ফেয়ার ছিল বা এর মধ্যে আর কোনো প্যারামিটারস ছিল কিনা সেটা উনি জানেননা, কিন্তু তারপর থেকে ওনারা হাবড়ায় থাকতে শুরু করেন এবং আসতে আসতে ফ্যামিলির অনান্য মেম্বাররাও ওই কাউলজানি থেকে শিফট করে হাবড়ায় চলে আসেন। আর আমার ঠাকুরদার ফ্যামিলিতে, মানে ঠাকুরদার ফ্যামিলির বাকিরা শোলধনেই পড়ে রয়েছিলেন, আমার ঠাকুরদা অ্যাকচুয়ালি এসছিলেন ল পরার জন্য কলকাতায়। সেটা পার্টিশানের একদম ইমিডিয়েটলি পরে না, কয়েক মাস চলে যাবার পরে, অ্যারাউন্ড '৪৮ কি এন্ড '৪৮ অথবা আর্লি '৪৯ উনি কলকাতা আসেন। উনি এখানে আসার পরে কলকাতা পুলিশ ফোর্সে উনি একটা চাকরি নেন এবং তার সাথে সাথে কলেজে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে থাকেন। তো অ্যারাউন্ড '৫১ উনি একবার বাংলাদেশে ফেরত গেছিলেন, ওনার গ্রামে, শোলধন। তো ইন রিয়্যালি ফেরত যাবার অনেকগুলো কারণ ছিল, তার মধ্যে একটা মেজর কারণ ছিল যে মানে ওনার ফ্যামিলিকে উনি হয়ত কনভিন্স করাতে চাইছিলেন যে মানে কলকাতার দিকে চলে আসার জন্য। কিন্তু শোলধন গ্রামে এই পার্টিশান নিয়ে এই ধরনের কোনোরকম মানে কোনো আনটুওয়ার্ড ইন্সিডেন্ট বা কোনো মেজর কোনো রাইভ্যালরি কিছু ছিলনা যেটার জন্য অ্যাকচুয়ালি আমার ঠাকুরদার ফ্যামিলি, দে ওয়ার কোয়াইট কম্পর্ফোটেবল ওভার দেয়ার। তো বাকিরা ঐজন্য তারা আর ফাইণ্ড করতে চাননি। তো আমার ঠাকুরদা গেছিলেন ওখানে, আমার ঠাকুরদা ছবি টবি তুলতে ভালবাসতেন, গ্রামে, শোলধন গ্রামে গিয়ে সবার, গ্রামে যত লোকজন আছে সবার ছবি টবি তুলে দিয়েছিলেন। গ্রামের লোক কোনদিন আগে কোনো ক্যামেরা দেখে নি, তারা সব ৩০-৩৫ জন একসাথে পোজ দিয়ে ছবি টবি তুলেছিল। তো শোলধনের লোকেশনটার জন্য, ঢাকা শহরের কাছে হবার জন্য, শোলধনের মধ্যে কম্যুনাল ভায়োলেন্স খুব বেশি ছিল না। এটা আমার ঠাকুরদার যা মেমরি আছে, সেখান থেকে উনি এটা অনেকবার এটা বলেছেন। কিন্তু আমার ঠাকুরদার স্কুল যেখানে ছিল, সেটা ছিল টাঙ্গাইল জেলাতে মাহমুদনগর বলে একটি জায়গাতে, তো সেইখানে উনি একটা রেসিডেনসিয়াল স্কুলে উনি পড়াশোনা করেছিলেন। তো এবার ওনার লার্জার ফ্যামিলি, মানে সাম রিলেটিভস, তারা ওই

শহরেই, মানে মাহমুদনগরেই থাকতেন। তো তাদের মধ্যে কেউ কেউ অলরেডি রয়ে গেছেন এবং কেউ কেউ এখানে চলে এসছিলেন। তো অ্যাপারেন্টলি যারা এখানে চলে এসছিলেন তারাও আর পরবর্তীকালে ওদিকে আর ফেরত যেতে চাননি, বা যারা ওখানে থেকে গেছিলেন তাদেরও ওখানে মনে হয়নি যে ওখানে কোনো প্রবলেম হচ্ছে, এখানে চলে আসা উচিত। তো মেইনলি আমার ঠাকুরদার ঠাকুমার কাছে পার্টিশান ইভেন্টগুলোর ব্যাপারে এই গল্পগুলোই শুনেছি।

দিশা : আচ্ছা আর এই যে তুমি বলছিলে না যে ঠাকুমার স্ট্রাগলটা অনেক বেশি ছিল, ঠাকুমা এবং ঠাকুমার ফ্যামিলির অ্যাজ কমপেয়ারড টু তোমার ঠাকুরদা। তো এরকম কোনো স্পেসিফিক গল্প শুনেছ কি? মানে এখানে এসে যদি ওদেরকে কিছু অন্যরকম কিছু ফেস করতে হয়েছিল, বা ওখান থেকে এখানে এসে কি কোনো লাইফ চেঞ্জ হয়েছিল সেরকম ভাবে? মানে স্টানডারড অফ লিভিং বল...

শান : হ্যাঁ, মানে ইমিডিয়েটলি দেখতে গেলে আমার ঠাকুমার ফ্যামিলি মোটামুটি ওয়েল-টু-ডু ছিল, পাকিস্তানে, সরি, মানে বাংলাদেশে। তো যেটা আগে বললাম আর কি যে অন্তত তিনটে পাকা বাড়িওলা ফ্যামিলি ছিল, তার মধ্যে একটা ছিল আমার ঠাকুমার ফ্যামিলি. অনেক ওয়েলথ্, অনেক টাকাপয়সা ওখানে রেখেই তড়িঘড়ি করে চলে আসতে হয়েছিল এদিকে। তো এখানে এসে যদিও আমার বড় দাদু উনি চাকরি করতেন কলকাতায়, এবং আমার ঠাকুমার মেজদা মানে আমার মেজ দাদু, তিনি একটা হাবড়াতে কিছুদিন পর একটা কাপড়ের দোকান দিয়েছিলেন। তো তার জন্য ইনিশিয়াল ২-৩ বছরের পর থেকে আসতে আসতে ফাইনানশিয়াল যে প্রবলেমটা ওনারা ফেস করছিলেন, তো সেটা আস্তে আস্তে ইট ওয়ার্কড আউট, কারণ অবভিয়াসলি একটা জায়গা থেকে হঠাৎ করে কোনরকম প্রিপারেশান না নিয়ে আর একটা নতুন জায়গায় এসে সেট্‌ল করলে ইনিশিয়ালি ফাইনানশিয়াল যে প্রবলেম হবে, থাকা টাকার যে প্রবলেম হবে, এবং আশেপাশে কোনো ফ্যামিলিকেই ওনারা কাউকে চিনতেন না এবং ওই গ্রামের মধ্যে আরও বেশ কয়েকটা ফ্যামিলি ওই একই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এসে আর কি তারা একসাথে সেট্‌ল করেছে। সো

সেদিক থেকে দেখতে গেলে মানে যারা ওখানকার প্রতিবেশী, যারা ওখানকার প্রতিবেশী হলেন, সেই প্রতিবেশীরা সবাই দে আর ডিসকভারিং ইচ আদার দেন ওনলি। তো সেখানে একটা এডজাস্টমেন্টের দিক থেকে একটা ইনিশিয়াল একটা প্রবলেম হয়েছিল। তো সেইটা আস্তে আস্তে ওয়ার্ক আউট, করে যায়। কিন্তু আমার ঠাকুরদার প্রবলেমটা হয়েছিল একটু অন্য টাইপের এর কারণ আমার ঠাকুরদা একদম গ্রামের ছেলে, এসেছেন কলকাতা শহরে এসে, আর আমার ঠাকুরদার ফ্যামিলি, শোলধন গ্রামে আমার ঠাকুরদার ফ্যামিলি খুব একটা পয়সাওলা ফ্যামিলির লোক ছিলেন না, নিম্ন মধ্যবিত্তই বলা যায়। তো সেই জন্য হয়ত কলকাতার স্ট্যানডার্ড অফ লিভিং করতে আমার ঠাকুরদার একটু প্রথমে অসুবিধা হচ্ছিল যে কারণে ওনাকে চাকরিটা নিতে হয় পড়াশোনা চালিয়ে যাবার সাথে সাথে। তো আর প্রথমে উনি আশ্রয় নেন আমাদের এক দূর সম্পর্কের রিলেটিভ তার বাড়িতে। তারপরে উনি ফাইণ্ড করেন তালতলার কাছে একটা ফ্ল্যাটে, একটা বাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়ে। সেখানেও একটা ফাইনানশিয়াল দূরাবস্থার মধ্যে দিয়ে কিছুদিন যেতে হয়েছিল। তারপরে আস্তে আস্তে বিয়ের আগে একটু টাকাপয়সা জমিয়ে ওনার সেই প্রবলেমটা সর্ট আউট হয় কারণ এটা আমার ঠাকুরদার মুখ থেকে যেটা আমি যা শুনেছি যে গ্রামে থাকার সময় যে আউটলুক, যে মেন্টালিটি, যা ওয়ে অফ লিভিং - এর যে এলিমেন্টসগুলো তিনি গ্রামে যা ফেস করতেন, কলকাতায় এসে একসাথে এত এলিমেন্ট দেখে ইনিশিয়ালি ওনার একটা এলিয়েনেশন হয়েছিল, একটা সেন্স অফ এলিয়েনেশন হয়েছিল। কিন্তু আমার মনেহয় সেটা খুব তাড়াতাড়ি উনি সেটা ওভারকাম করে উঠতে পেরেছিলেন। আমার কাছে একটা মানে আমাদের বাড়িতে একটা পুরনো ডকুমেন্ট আছে, আমার ঠাকুমা এসমস্ত আর কি পুরনো ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে রাখেন। তো একটা ওরকম ডকুমেন্ট আছে যেখানে আমার ঠাকুরদা খুব মেটিকুলাসলি তখন মাসের হিসেব রাখতেন। এবং সেই, মাসে বলছি, সপ্তাহের হিসেব একটা কাগজে মেটিকুলাসলি লিখে রাখতেন। তো সেটা যখন বাংলাদেশে থাকতেন তখন ওবভিয়াসলি সেগুলো লিখে রাখার দরকার পড়েনি, কিন্তু যখন ওনাকে এখানে এসে নিজেকে, নিজের পয়সায় এসে থাকতে হচ্ছে তখনই এই হিসেব নিকেশের কোয়েশ্চেনটা আসে। তো সেখানে কতগুলো জায়গাতে দেখা

যাচ্ছে যে, মানে দেখেছি যে, সাবান কিনেছেন, শ্যাম্পু কিনেছেন, টুথব্রাশ কিনেছেন, এগুলো সব আলাদা আলাদা করে লেখা। সিনেমা রবিবার এক টাকা, এক টাকা নয়, ওটা আরও কম হবে র‍্যাদার, এক পয়সা প্রব্যাবলি । এক লেখা আর কি। তো এই জিনিসগুলো, এই খরচগুলো তো ওনার গ্রামে ছিলনা, তো এইগুলো মেন্টেন করতে গিয়ে প্রথমে যে ফাইনানশিয়াল প্রবলেমটা যেটা ছিল আর কি তো সেটা আস্তে আস্তে ওয়ার্ক আউট করে যায়।

দিশা : আর এই যে ডকুমেন্টের কথা বলছ, তো এই ডকুমেন্টগুলো তোমার ঠাকুমা যে এখনো রেখে দিয়েছেন, মানে এখনো উনি কিরকম ফিল করেন? মানে অনেককাল আগেকার জিনিসপত্র তো এখনো ওনার ফিলিংস কি, মানে মেটেরিয়াল যে জিনিসপত্রগুলো রয়েছে এখনো?

শান : অ্যাকচুয়ালি এই ডকুমেন্টগুলো মানে উনি রেখে দিয়েছেন বলতে যে এটা রেখে দিয়েছেন আউট অফ হ্যাবিট, মানে উনি কোনো পুরনো কাগজপত্র, দলিল, ছবি, এগুলো উনি কোনদিনই ফেলেননা। তো এগুলো অনেকদিন যাকে বলে বারিড ছিল অন্যান্য কাগজপত্র, অন্যান্য জিনিসপত্রের তলায়। তো আমার প্রজেক্টটা করার সময় আমি আমার ঠাকুমাকে, মানে আমার নিজের মেটেরিয়ালের দরকার পড়েছিল তো সেইজন্য আমি ঠাকুমাকে বলি যে ওগুলো তুমি বের কর, মানে পুরনো ছবি টবির সাথেই কারণ আমার ঠাকুরদার যে প্রিন্টস্ আর নেগেটিভস্ এর যে বাঞ্চ যেগুলো সমস্ত ছিল আর কি, তো সেগুলো যেখানে রাখা ছিল এই ডকুমেন্টসগুলো তার সাথেই রাখা ছিল। তো এগুলো বের করার পরে আমি একটা জিনিস দেখেছি যে আমি যখন পুরনো ছবি বা পুরনো দলিলগুলো যে এসটনিশমেন্ট, যে সেন্স অফ ওয়ান্ডার দিয়ে আমি অ্যাপ্রিশিয়েট করতে পারি, আমার ঠাকুমার মেমারি থেকে ওই জিনিসগুলো পুরোপুরি হারিয়ে গেছে আর কি। উনিও অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন কাগজপত্রগুলো যখন বের করলাম, উনিও এইগুলো রিডিস্কভার করলেন।

দিশা : আর তুমি যে প্রজেক্টটার কথা বলছ, সেটা নিয়ে যদি বল?

শান : প্রজেক্টটা বলতে আমার ঠাকুরদা মারা যান বেসিক্যালি ২০১২-র ডিসেম্বারে। তো তার আগে উনি প্রায় বছর দুয়েক খুবই অসুস্থ ছিলেন, বেডরিডেন ছিলেন। এবং ঠাকুমাকে ওবভিয়াসলি তার জন্য অনেকটা প্রেশার নিতে হয়েছিল এবং মানে ওই দু'বছর আমার ঠাকুমাও বাড়ি থেকে বেরোননি, সারাক্ষণ ঠাকুরদার সাথেই ছিলেন। এবং একটা চারিদিক, মানে মেন্টাল অ্যান্ড ফিজিকাল, দুটো দিক থেকেই শি ওয়াজ এক্সজস্টেড. তো আমার ঠাকুরদার কাজ শেষ হওয়ার কিছুদিন বাদে আমি ঠাকুমাকে আমার মনে হলো এবার ঠাকুমার একটু বেরোনো টেরোনো উচিত কারণ এতদিন বাড়িতে থেকে, আমিই প্রস্তাব দিলাম ঠাকুমাকে যে কোথাও একটা ঘুরে আসি চল বা কালকে আমার ফ্রি আছে তুমি যদি কোথাও যেতে চাও। তো আমাদের আমরা আমার ঠাকুমা মা বাবা যেখানে থাকেন সেটা হচ্ছে সোদপুর খড়দা ওই অঞ্চলে। তো সেই বাড়িতে আসার আগে মানে সেই বাড়িটা আমার ঠাকুরদা করে যাবার আগে ওনারা থাকতেন ডানলপ পুলিশ কোয়ার্টারে। তো আমার ঠাকুমার ওই জায়গায়টা আর কি খুবই প্রিয় জায়গা, তো ঠাকুমা আমাকে বললেন একবার ডানলপে ঘুরে আসি, দেখি আসি জায়গাটা এতদিনে কি হয়েছে। তো এই জায়গাটার থেকে প্রজেক্টটা স্টেম আউট করে যে আমরা একদিন আমরা এরকম বললাম যে শুধু ডানলপে কেন, কারণ ডানলপের আগে ওনারা থাকতেন বেলগাছিয়াতে একটা ফ্ল্যাটে, পাইকপাড়ার কাছে। এবং ওখানে অলরেডি আমাদের একটা মানে ঠাকুমার মেজ দিদি আর কি তো ওনার ফ্যামিলি অলরেডি ওই বেলগাছিয়াতে অলরেডি ওখানে থাকে। তো আমরা বেলগাছিয়াও যাই। তো এই থেকেই আমার মধ্যে আইডিয়াটা হলো যে মানে আমার ঠাকুরদা বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় আসার পরে প্রায় কলকাতায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ৮/৯টা জায়গাতে ওনারা থেকেছেন। আমার ঠাকুরদা এখানে এসে প্রথমে উঠলেন ওই তালতলার কাছে একটা ফ্ল্যাটে। সেখান থেকে চলে গেলেন বাগবাজার। বাগবাজার হাড়ি গলি বলে একটা জায়গা আছে ওই গলিতে একটা বাড়িতে ওনারা ছিলেন। সেখান থেকে ওনারা চলে যান চিৎপুর। চিৎপুরে প্রায় বছর চার/পাঁচেক ছিলেন। চিৎপুর থেকে ওনারা চলে যান বেলগাছিয়া। আর বেলগাছিয়া থেকে এই বাড়ি। তো আমার মনে

হলো যে যদি আমার ঠাকুমাকে নিয়ে এই সবকটা জায়গাতেই আমরা যেতে পারি, যে পুরনো বাড়িগুলো আছে নাকি, ওনার কোনো মেমারি এই এখনকার চেহারা দেখলে কোনো ট্রিগার হয় কিনা, তো সেগুলো এক্সপ্লোর করবার জন্য। আর সেইটা শুরু করার পরে যখন আমার ঠাকুমা যখন জিজ্ঞেস করলেন যে কেন তুই কি ছবি টবি কিছু তুলবি, তো এই কোয়েশ্চনটা খুব আমার ঠাকুমার পক্ষে খুব ন্যাচারাল বিকজ মানে আমার ঠাকুরদা উনি খুব একজন অ্যাভিড শখের ফটোগ্রাফার ছিলেন আর কি। মানে '৪৮-এ এসেই আর কি এদিকে পকেটে পয়সা নেই অথচ প্রথম স্যালারি দিয়েই একটা কে বি ১০ কোডাক ব্রাউনি একটা কিনে ফেলেছেন। তো মানে চুটিয়ে ছবি তুলে চলেছেন। প্রায় তখন কোডাক ব্রাউনিতে ইউজ হত ৬২০ ফিল্ম, তো ৬২০ ফিল্ম, যখন থেকে অবসোলিট হয়ে যাওয়া শুরু করলো আর কি, তো তখন থেকে সেটা মিড সেভেন্টিস, তো ততদিন অব্দি উনি রেগুলার ছবি তুলেছেন। এবং এই প্রত্যেকটা জায়গায়, যেখানে ওনারা থেকেছেন আর কি, সেই সমস্ত জায়গায় ওনার তোলা ছবি আছে আর কি, মানে ফ্যামিলি মেম্বারের ছবি, তারপরে কোথাও বেড়াতে গেছেন সেখানকার ছবি, ইন জেনারেল ল্যান্ডস্কেপ, বা আমার ঠাকুমা মানে আমার ঠাকুমা-ঠাকুরদার যেখানে বিয়ে হয়েছিল হাবড়াতে, হাবড়াতে মানে শ্বশুরবাড়িতে গিয়েও প্রচুর ছবি তুলেছেন। তো সেই সমস্ত ছবি টবি আমি নেগেটিভগুলো রেস্টোর করা বা যে প্রিন্টগুলো নষ্ট হয়ে গেছে যদি নেগেটিভ থাকে সেগুলো থেকে আবার প্রিন্ট বের করা, এই কাজগুলো আমি তখন শুরু করি। সেটা করতে করতে আমি দেখলাম যে আমার ঠাকুরদার ছবির রিপেয়ারটা অনেক ইউনিক এবং ওভার দ্য ইয়ারস্ ওনার ছবি তোলার স্টাইল, ওনার ছবি তোলার সাবজেক্ট, ওনার ফিলজফি বিহাইন্ড টেকিং আ ফটোগ্রাফ এগুলো ওভার দ্য ইয়ার্সে প্রচুর চেঞ্জ হয়েছে। উনি ৪৮-এ যেভাবে ছবি তুলতেন, ৬৮-এ উনি সেভাবে ছবি তুলতেন না। এবং ওনার ছবি তোলার ব্যাপারে কোনো বাছবিচার ছিলনা। এবং এরকমও দেখেছি যে আমার ঠাকুমার সাথে বিয়ে হবার আগে যখন আমার ঠাকুরদা একজন এলিজিবল্ ব্যাচেলর উনি পাত্রী দেখতে গিয়ে উনি পাত্রীর ওই সেই মেয়েটির ছবি তুলে নিয়ে চলে এসছেন এরকম ৩/৪টে ইন্সট্যান্স আছে আর কি। তার সাথে বিয়েটা আর হয়নি, বাট ছবিটা আছে। তো এইগুলো

কম্পাইল করতে করতে আমি ঠিক করলাম যে আমার প্রজেক্টটাকে এরকম একটা শেপ দেব যে যেখান দিয়ে আমি এই যারা মানে বাংলাদেশ থেকে চলে এসছেন এই রেফিউজি মিডল ক্লাস, তো কলকাতায় এদিকে চলে আসার পরে ওনার মানে ছবির প্রগ্রেশন দেখে আমার মনে হয়েছে যে এই রেফিউজি মিডল ক্লাসের একটা আপওয়ার্ড সোশ্যাল হয়েছে। তো সেইটা ওই '৪৮ থেকে মিড সেভেন্টিস, অবধি ছবিগুলো প্রগ্রেসিভলি দেখলে আমার ওই মবিলিটিটা খুব চোখে পড়ে। সেটার সাথে সাথে আমি আমার ঠাকুমাকে নিয়ে যখন দেখলাম যে কলকাতার সমস্ত জায়গাগুলোতে গিয়ে আমি ওনার ছবি টবি তুললাম, ইভেন হাবড়াতেও যেখানে পুরনো গ্রাম ছিল সেখানেও গেছিলাম। তো তার পরে আমার মনে হলো যে, আমি ঠাকুমাকেও অফার করলাম যে তাহলে আমরা বাংলাদেশেও যাই, গিয়ে আমার ঠাকুরদা যে স্কুলে পড়েছেন ওটা রেসিডেন্সিয়াল স্কুল, সো উনি থেকেছিলেন, তো ওখানে যাই, ওই জায়গাটাও দেখি, ওখানেও ছবি তুলি, প্লাস শোলধন যে গ্রামে আমার ঠাকুরদার জন্ম, সেখানে গিয়েও ছবি তুলি। তো আমার ঠাকুমা এককথায় রাজি হয়ে গেলেন, তো ওনাকে নিয়ে চলে গেলাম ওখানে। গিয়ে মাহমুদনগরে ছবি তুললাম, আমার শোলধনে ছবি তুললাম, আমার ঠাকুরদার ফ্যামিলির মানে আমার ডিস্ট্যান্ট রিলেটিভরা আর কি ওই যে ফ্যামিলি ওখানে রয়ে গেছিল, তাদের ডিসেন্ড্যান্টসরা এখনো ওখানে থাকে, বাংলাদেশে থাকে। ওনারাও প্রচুর হেল্প করেছেন। তো আমি যেটা করছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমার ঠাকুরদার তোলা প্রচুর কিছু ছবি আর আমার তোলা অল্প কিছু ছবি তো সেগুলো মিলিয়ে একটা কমপাইলেশন।

দিশা : তো এই ঠাকুমাকে নিয়ে যে বিভিন্ন জায়গায় গেলে তো ওনার অভিজ্ঞতাটা কিরকম ছিল সেটা নিয়ে যদি কিছু বল?

শান : ওনার এক-একটা জায়গায় গিয়ে এক-এক রকম রিঅ্যাকশন হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, বাংলাদেশে যখন গেলাম, বাংলাদেশে শোলধনে গিয়ে শি গট ভেরি

ইমোশানাল আর কি কারণ উনি একবার কারণ মাঝখানে আমার ঠাকুরদা যখন বেঁচে ছিলেন আর কি তখন ওনারা একবার বাংলাদেশ গেছিলেন কিন্তু সেটা বহুদিন আগে। এবং গিয়ে উনি, তখন একজ্যাক্টলি ওনার কি রিএকশ্যান ছিল সেটা আমি জানিনা। কিন্তু আমি যখন নিয়ে গেলাম তখন, যেহেতু শোলধনের পুরনো ছবি আমার কাছে ছিল, '৫১-এর আমার ঠাকুরদা যখন ফেরত গেছিলেন, তো সেই সমস্ত ছবি গ্রামের ছবি যেহেতু আমার কাছে ছিল, তো সেগুলো আমার ঠাকুমা ইতিমধ্যে দেখে নিয়েছেন। ওই ছবিগুলো নিয়ে রিসেন্টলি কাজ হচ্ছে। তো আমার ঠাকুমা সেই ছবিগুলো দেখেছে, এবং পুরনো ছবি থেকে কিছু কিছু লোককে আল্টিমেটলি করেছে, এটা অমুক ওটা তমুক এদেরকে আল্টিমেটলি করেছে। তার মধ্যে একটা ঘটনা আমি বলি কারণ এই ঘটনাটা খুবই ইন্টারেস্টিং। আমার ঠাকুরদার তোলা একটা ছবি আছে যেখানে আমার ঠাকুরদার বাবা, আমার ঠাকুরদার মা এবং তারা বাড়ির সামনে দাওয়াতে বসে মুড়ি মাখছেন। আমার ঠাকুরদার মা মুড়ি মাখছেন আর আমার ঠাকুরদার বাবা বসে হুঁকো খাচ্ছেন। আর পাশে একটি বাচ্ছা সে মুখে হাত দিয়ে দাড়িয়ে আছে হাসি হাসি মুখ করে। তো আমার ঠাকুমা অনেক্ষণ ধরে ওই ছবি দেখে আর কি, আমি সবাই কে জিজ্ঞেস করছিলাম ঠাকুমাকে দেখিয়ে ছবিগুলো দেখিয়ে যে এদের মধ্যে কাউকে চেন কি না, থাকলে তাদের নাম। তো আমার ঠাকুমা একটা ছবি দেখে, ওই বাচ্চাটিকে দেখে বললেন এ তো হাসি। আমি বললাম ইনি কে? তো বললেন ইনি হচ্ছেন যে আমার ঠাকুরদার নিস সম্পর্কে। তো আমি বললাম ইনি কি এখানে চলে এসছেন না বাংলাদেশেই? তো আমার ঠাকুমা বললেন যে যদ্দুর জানি ইনি বাংলাদেশেই আছেন, হাসি তো বাংলাদেশেই ছিল, এখন কোথায় আছে বলতে পারবনা। তো আমরা শোলধনে এই যাদের যাদের ছবি পাওয়া গেছে বা পুরনো লোকজন যারা ওখানে থাকতেন ওই ফ্যামিলির লোকজন তারা সবাই শোলধন থেকে ফাইণ্ড করে গেছেন। শোলধনের যারা বাড়িতে মানে আমার ঠাকুরদার ফ্যামিলির যে পোরশনটা রয়ে গেছিল, তাদের ডিসেনডান্টস্‌রা এখন আর শোলধনে থাকেনা, তারা ঢাকা শহরে চলে এসছেন। তো শোলধনের ওই বাড়িগুলোতে এখন লোকাল মুসলিম ফ্যামিলি তারা থাকে। তো এবার তাদেরকেও আমরা দু-একজনকে জিজ্ঞেস করলাম যে এখানে এনারা থাকেন কোথায়, এবার আমার অলরেডি ফ্যামিলির যারা

ডিসেনডান্টস্ তার ওখানে ছিলেন, আমার সম্পর্কে যিনি জেঠু হন, উনি ছিলেন। তো উনি বললেন যে আমি কিছু কিছু, কারু কারুর খবর আমি জানি। তো বলে আমরা ওখান থেকে তার পাশের গ্রামে গেলাম। সেখানে অ্যাপারেন্টলি ওই ফ্যামিলির অলরেডি কিছু কিছু ডিসেনডান্টস্ এখনো অ্যাপারেন্টলি রয়েছেন। তো সেখানে আমি ঘটনাচক্রে যে সময়টায় গেছিলাম সেই সময়টা ছিল দুর্গা পুজো। তো ওই গ্রামের দুর্গা পুজোম ন্ডপে, এবং বাংলাদেশে গ্রামের দুর্গা পুজো খুব অদ্ভূত ভাবে হয় আর কি, ওখানে প্রোজেক্টর দিয়ে স্ক্রিনে মহিষাসুর মর্দিনীর যে ভিডিওটা সেটা দেখানো হয় এবং সেটা দেখে লোকজন নাচে, এদিকে প্যান্ডেলের প্রতিমা থাকে, প্রচুর খাওয়াদাওয়া হয় আর গ্রামের সমস্ত হিন্দু কমিউনিটি ওখানে থাকে। তো সেখানে আমরা, এবার বাংলাদেশের লোকজনদের আতিথিয়তার তুলনা হয়না। আমরা ওখানে একজন স্ট্রেনজারের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম, সেখানে খাবার দাবার খেলাম, আমরা ইন্ডিয়া থেকে আসছি শুনে ওনারা বোধয় একটু বেশিই একটু আপ্যায়ন করলেন। তো সেইখানে হঠাৎ একজন প্রৌঢ়, প্রৌঢ় বলা যাবেনা, বৃদ্ধাই, বৃদ্ধা ভদ্রমহিলাকে দেখে আমার ঠাকুমা বললেন এনাকে তো চেনা চেনা লাগছে। এবং দেখা গেল ইনিই হচ্ছেন সেই হাসি। এবং তারা একে অপরকে চিনতে পারলেন কারণ এই হাসি যিনি ইনি অ্যাজ আমার ঠাকুমাকে দেখেছেন ঠাকুমার বিয়ের সময়। যখন বিয়ে হয়েছিল তখন বাংলাদেশ থেকে আমার ঠাকুরদার ফ্যামিলির লোকজন হাবড়াতে এসছিলেন এবং তারা পরে আবার বর্ডার পেরিয়ে চলে গেছিলেন। তো সেই সময় উনি, এই হাসি, উনি আমার ঠাকুমাকে অ্যাজ দেখেন। এটা ১৯৫৪ তো আর এই দেখাটা হলো ২০১৪-এ। তো এই ঘটনাটাতে আমার ঠাকুমা খুবই ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলেন। আর অন্যান্য জায়গাতে আমার ঠাকুরদার স্কুল দেখে, মানে আমার ঠাকুরদার স্কুল আমার ঠাকুমার কাছে আলাদা করে কোনো মিনিং ক্যারি করে না। তো ওই জায়গাটা ওনার কাছে আর পাঁচটা নতুন জায়গার মতই। কিন্তু বিয়ে হবার পরে ওনারা যে যে জায়গাগুলোতে থেকেছিলেন, সেই জায়গাগুলোতে যখন আমার ঠাকুমাকে নিয়ে গেছি, তখন সেই জায়গাগুলোতে দেখেছি যে এক-একটা এরিয়া দেখে এক-একটা মেমরি ট্রিগার করেছে। যেরকম চিৎপুরের যে বাড়িটায় ওনারা থাকতেন তো সেটায় ওনার ফ্ল্যাটটা ছিল টু ফ্লোরে। তো সেখানে আমি আমার ঠাকুমাকে বললাম যে যেই সিঁড়িটা

দিয়ে অ্যাকসেস করা যায়, সেটা খুবই মানে দৈন্যদশা যাকে বলে সেটার। তো আমি ঠাকুমা কে বললাম তোমায় এখন আর রিস্ক নিয়ে এটার ওপর দিয়ে উঠতে হবেনা, আমরা ছবিটা বরঞ্চ... তো আমার ঠাকুমা বললেন না এতদূর এসছি, ওপরে উঠি। তো আমি ওনাকে অন্য একটা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিয়ে গেলাম। নিয়ে গিয়ে যে ঘরটায় ওনারা থাকতেন সেটায় গিয়ে দেখলাম যে সেটা এখন একটা খাদিমের গোডাউন হয়ে গেছে, সেখানে আর থাকার বন্দোবস্ত নেই। তো সেইটা দেখে উনি খুব... যে এখানে আর কেউ থাকেনা... কারণ এর আগে যে জায়গাগুলোতে গেছিলাম, বেলগাছিয়া বা ডানলপ পুলিশ কোয়ার্টার, সেখানে অলরেডি কোনো না কোনো ফ্যামিলি থাকে, আমার ঠাকুমা সেখানে গিয়ে তাদের সাথে গল্পগুজব করেছেন এবং তারাও... কিন্তু চিৎপুরের জায়গাটায় যখন গেলাম ওটা একটা গোডাউন হয়ে গেছে থাকার জায়গাটা সেটাও ওনার কাছে ব্যাপারটা ভালো মনে হয়নি আর কি। তো আর তার সাথে আরেকবার একটা যেরকম ওই বাগবাজারে হাড়ি গলিতে যে বাড়িটায় ওনারা অল্প কিছুদিনের জন্য ছিলেন, সেখানে বাড়িটার মধ্যে উনি ঢুকতেই চাননি কারণ ওই বাড়িতে যে মালিক এবং তাদের যে ফ্যামিলি ছিল তাদেরকে উনি আবার পছন্দ করতেন না। তো সেখানে আমি বললাম যে ঠিক আছে আমরা বাড়িটা বাইরে থেকে দেখেই চলে আসব। তো এরকম ডাইভারস রিএকশ্যান হয়েছে আমার ঠাকুমার।

দিশা : আচ্ছা তোমার ঠাকুমার বাবার কথাটায় আসছি, তুমি বললে যে উনি হেডমাস্টার ছিলেন একটা মাদ্রাসার, মানে হিন্দু ফ্যামিলির হওয়া সত্ত্বেও। তো ওনার এটার জন্য কোনো প্রবলেম হয়েছিল বা এই সংক্রান্ত কোনো গল্প শুনেছ কি ঠাকুমার কাছে, মানে ওনার বাবার সম্পর্কে?

শান : আমি যদ্দুর জানি যে, মানে উনি যেটুকু বলেছেন আমার কাছে, আমার যতটুকু মনে আছে তার মধ্যে, যে ওই গ্রামে, কাউলজানি গ্রামে, প্রায় ২০-৩০% হিন্দু থাকত। তো এবং মুসলিমদের মধ্যেও একটা, কিছু কিছু ফ্যামিলি ছিল যারা ব্যবসা ট্যাবসা করে দে ওঅ্যার কোয়াইট ওয়েল অফ। তো এবার যেহেতু গ্রামটা একদম ইনটেরিয়র-এ

এবং সেখানে মাদ্রাসা ছিল একটাই, এবং গ্রামে যে শিক্ষিত লোক খুব বেশি ছিল তা নয় ওই সময়, তো যেহেতু আমার ঠাকুমার বাবা ওখানকার হেডমাস্টার ছিলেন সেইজন্য হেডমাস্টার হওয়ার জন্য ওনাকে কোনো রেসিয়াল বা রিলিজিয়াস কোনো প্রবলেম ফেস করতে হয়নি। আমার যা শুনে মনে হয়েছে। এবার ওখানকার বাকি হিন্দুদের কি কনডিশন ছিল সেটা আমি বলতে পারবনা।

দিশা : তোমার কাছে দেশভাগ বা পার্টিশান কি মিন করে?

শান : কোন টাইপের পার্টিশান? শুধু এই ভারত-বাংলাদেশ পার্টিশান নাকি এনি পার্টিশান?

দিশা : দুটোই, তুমি '৪৭-টা দিয়েই বল?

শান : আমার কাছে ডিরেক্টলি দেশভাগ একটা হিসটোরিক্যাল ইভেন্ট ছাড়া আর কিছুই না।

দিশা : ছোট থেকে তো এত গল্প শুনছ, এতটা ইনফ্লুয়েন্স আছে, তা সত্ত্বেও এটা শুধুই একটা হিসটোরিক্যাল ইভেন্ট ছাড়া কিছু মনে হয়না?

শান : ডায়রেক্ট ইনফ্লুয়েন্স আমার জীবনে বা আমার ওয়ার্ল্ডভিউতে দেশভাগের কিছু আছে বলে আমি নিজে থেকে কিছু আল্টিমেটলি করতে পারিনা। হয়তো, হ্যাঁ, মানে আমার ফ্যামিলির কনডিশন, আমার এই যে ফটোগ্রাফিতে আমার ইন্টারেস্ট এগুলো আমার ঠাকুরদার থেকে কিছু কিছু আমি পেয়েছি। তো আমার এরকম হতে পারে যে আমার ঠাকুরদা হয়ত যদি শোলধনেই পরে থাকতেন তাহলে হয়ত উনি ক্যামেরাটা কিনতেন না। ওনার ছবি টবি তে কোনো ইন্টারেস্টই হতনা, আমি বাংলাদেশে বড় হতাম, আমার বড় হওয়া অন্যরকম হত, সেটাও হতে পারে। কিন্তু অ্যাজ অফ নাও, আমি ডিরেক্টলি কিছু আল্টিমেটলি করতে পারিনা।

দিশা : আর এই ভারত বাংলাদেশের মধ্যে যে বর্ডার ব্যাপারটা, এটাকে তুমি কিভাবে দেখছ?

শান : কিভাবে দেখছি বলতে?

দিশা : মানে, অ্যাজ ইন, একটা ডিভিসন, ধর সেটা ভিসা অ্যাজস্পোরট এর ক্ষেত্রেই হোক, মানে যে একটা দেশ, দুটো দেশ আগে এক ছিল, তারপরে যে ভাগ হয়ে গেল, এই দুটো দেশকে যেখানে আলাদা করা হচ্ছে, মানে সেটা ফিজিক্যাল প্রেজেন্স বল বা তোমার কাছে যদি অন্য কোনোভাবে সেটা অ্যাফেক্ট করে, একটা বর্ডারের প্রেজেন্স, সেটা তুমি কিভাবে দেখছ?

শান : না সেই দিক থেকে দেখতে গেলে কোনো দেশের মধ্যেই বর্ডার থাকে এটা আমি পছন্দ করিনা। বাংলাদেশ যেতে গিয়েও সে আমাকে অ্যাজস্পোরট অফিস, অ্যাজস্পোরট জমা দিয়ে ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে হয়, ইওরোপ যেতে গেলেও তাই করতে হয়। আমি মনে করিনা এগুলো থাকা উচিত। অ্যান্ড আই হোপ যে ইন ফার ফিউচার এই ধরনের ডিভাইসিভ পলিসিগুলো থাকবেনা। মানে বাংলাদেশ বলে আমার আলাদা করে কোনো রিগ্রেট নেই আর কি, যে বর্ডার একজিস্ট করে।

দিশা : তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়ে তোমার বাড়ি কোথায়, তো তুমি কি বলবে?

শান : খুব সত্যি কথা বলতে গেলে, মানে, আমার পারসোনাল ওপিনিয়ন বলতে আমি যেখানে থাকি, সেটাই আমার বাড়ি। আজকে আমি কলকাতায় আছি, কিছুদিন আগে আমি সোদপুরে ছিলাম, আমার ফ্যামিলি ও এক-এক জায়গা থেকে এক-এক জায়গায় ঘুরেছেন আর কি, কোনো জায়গায় পারমানেন্টলি থাকেননি আর কি, সেই জন্য ওই সেন্স অফ বিলঙগিং, এই বাড়ি বলতে, হোম বলতে যে সেন্স অফ বিলঙগিং হয় সেটা আমার মধ্যে নেই। মানে আমি খুব র‍্যানডম র‍্যানডম জায়গায় গিয়ে আমার এই অ্যাট হোম ফিল হয়। পাহাড়ে গেলে, পাহাড়ে একটা গ্রামে আমি মাঝে মধ্যে যাই, সেখানে গেলে আমার মনে হয় এটাই আমার বাড়ি। সেখানে আমি থাকি, এক দেড় মাস

থেকে আমি চলে আসি। তো মানে আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে তোমার বাড়ি কোথায় আমি এই একটা জায়গার নাম আমি করতে পারব না।

দিশা : যেহেতু তোমার ঠাকুরদা ঠাকুমা সবাই ওপার বাংলা থেকে এদিকে চলে এসছেন, তোমার ওখানকার কোনো কালচারাল প্র্যাকটিস বল, সেটার ইনফ্লুয়েন্স কি তুমি এখনো দেখতে পাও নিজের ফ্যামিলিতে?

শান : হ্যা, ওবভিয়াসলি, কারণ, আমার নিজের মধ্যে অতটা নেই কিন্তু আমার ঠাকুমা, আমার বাবা মা যে মাছগুলো খেতে পছন্দ করেন, সেগুলো মোস্টলি বাংলাদেশের ইনফ্লুয়েন্স আছে আর কি। বা আমার ঠাকুমা তো মাঝে মধ্যে আমার মেজ দিদা বা উনি যখন ওনার বাপের বাড়ির ফ্যামিলির লোকজনের সাথে কথা বলেন, অনেক সময় বাঙাল ভাষায় কথা বলেন। সবসময় যে বলেন তা নয় তবে অনেকসময় বলেন। তো এই ধরনের ইনফ্লুয়েন্স কিছু আছে। প্লাস এরকমও দেখেছি যে, এটা আমার ঠাকুমার মতামত, আমি এটাকে আলাদা করে আল্টিমেটলি করতে পারিনা, যে এই পুজোআচ্চার নিয়মকানুন নাকি বাঙালদের সাথে ঘটিদের অনেক ডিফারেন্স আছে। তো সেইটা আমার ঠাকুমা একবার আমার মনে আছে, মানে আমাদেরই এক আত্মীয়, পরবর্তীকালে আত্মীয় আর কি, আমার এক পিসির ফ্যামিলি আর কি, তো তারা ঘটি। তো তার বাড়িতে গিয়ে একটা পুজোর অনুষ্ঠান ছিল, তো আমার ঠাকুমা, এই ঘটনাটা আমার ডিসটিঙ্কটলি মনে আছে কারণ এটা বেশিদিন আগের ঘটনা নয়। তো ওখানে গিয়ে আমার ঠাকুমা পুজোর নিয়মকানুন দেখে বললেন ওফ্, এরা তো আবার ঘটি, ঘটিরা এরকমভাবে পুজো করে। আই গেস এইগুলোই।

দিশা : তোমার লাইফে কোনভাবে এই ইনফ্লুয়েন্সগুলো আসেনি? তুমি তোমার ঠাকুরদা ঠাকুমার কথা বললে, কিন্তু তোমার লাইফে কোনভাবে ইনফ্লুয়েন্স করেছে কি এই প্র্যাকটিসগুলো?

শান : নট রিয়্যালি ইন ফ্যাক্ট, আমি যখন বাংলাদেশ গেলাম, আমার বাংলাদেশ, ঢাকায় তো আর থাকিনি, আমি থেকেছি এই গ্রামগুলোর মধ্যে। তো আমার ওই গ্রামগুলোয় গিয়ে আমার ঠাকুরদার যেরকম ওই গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে যে সেন্স অফ অ্যালায়েনেশনটা হয়েছিল, আমার ওই বাংলাদেশে গিয়ে একদম সিমিলার একটা অ্যালায়েনেশন হলো। যে আমি এখানকার কালচার, এখানকার একমাত্র লাঙ্গুয়েজটা সিমিলার, বাঙাল যদিও খুব একটা সিমিলার নয় বাংলার সাথে, তবুও যতুটুকু যা সিমিলার আছে, সেই লাঙ্গুয়েজ সিমিলারিটিটা ছাড়া আমি মানে যেকোনো বিদেশের লোকের সাথে কথা বললে যেরকম মনে হয়, আমারও ওখানে গিয়ে ওখানকার লোকেদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে একই রকম মনে হয়েছিল। মানে কিছু কিছু কালচারাল প্র্যাকটিস আমার দেখে মনে হয়েছে যে এটার পেছনে লজিকটা কি, হোয়াট ইজ দ্য র‍্যাশনেল বিহাইন্ড দিস? তো সেটা আমার যেরকম ফ্রান্সে গিয়েও হয়েছে, বাংলাদেশে গিয়েও হয়েছে, সো...

দিশা : এই যে অ্যালায়েনেশনের কথা বললে, তো এটার একটা এক্সাম্পল দিতে পারবে, মানে কি কি ঘটনায় তোমার এরকম স্পেসিফিক্যালি খুব অ্যালায়েনেটেড মনে হয়েছিল?

শান : এরকম ঘটনা অনেকগুলোই, যেরকম ছোটখাটো ঘটনা বলতে যে সকালবেলা আমি যাদের বাড়িতে ছিলাম আমরা সকালবেলা দেখলাম যে আমাদের খেতে দেওয়া হলো প্রায় এক বোল ভর্তি বিস্কুট। মানে এত বিস্কুট লোকে কি করে খায়? মানে একটা লোকে এত বিস্কুট কি করে খায় আই হ্যাভ নো আইডিয়া তার মধ্যে ৬/৭ রকমের বিস্কুট আছে ২/৩ টে করে। এবং বাংলাদেশে ওই পাউরুটি থেকে বানানো এক টাইপের বিস্কুট হয় যেটা দোজ পিপল মাস্ট হ্যাভ লাইক রিয়ালি, দে মাস্ট হ্যাভ বিন রিয়ালি ফন্ড অফ ইট আর কি কারণ ৫/৬টা করে দিয়ে গেছে। এবং আমি একটা দুটো করে নিয়ে খেলাম, এবং ওখানকার লোক দেখি সবাই পুরোটা সাবার করে দিল। সো আমি আমার ঠাকুমার দিকেও মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম। আমি ঠাকুমাকে পরে জিজ্ঞেস করলাম যে তোমাদের সময় কি ছোটবেলায় এত বিস্কুট খাবার চল

ছিল? ঠাকুমা বলল ওবভিয়াসলি নট, বিস্কুট কেন খাবে এত। এটা পরবর্তীকালে হয়ত এটা ডেভলপ করেছে ইন রিসেন্ট টাইমস। তারপরে ওখানকার ট্রাফিক মানে সেটা নিয়ে আর এক্সপ্লেন না-ই করলাম আর কি। ওখানকার হাইওয়েতে আমি ঘুরেছি তো, আর ওই যে সময়টায় গেছি সেই সময়টা হচ্ছে দুর্গা পুজো, মানে ঈদ-এর ঠিক আগে। তো সমস্ত গ্রাম থেকে ট্রাক ট্রাক বোঝাই গরু আর কি সব ঢাকার দিকে এগোচ্ছে। এবার ঢাকাতে ঢোকার আগে একটা জায়গায় একটা এরিয়া ছিল, নামটা আমি এই মুহূর্তে ভুলে গেছি ওই জায়গাটার নাম, তো সেখানে প্রায় এই ময়দানের মত সাইজ পুরো এরিয়াটার। সেটা একটা ওপেন হাট ফর বাইং ক্যাটেল তো আমি সেখানে একদিন আমার জ্যাঠা যিনি ছিলেন, সেখানে আমি আমার জ্যাঠা কে বললাম যে এই জায়গাটা একটু দেখতে যাই বিকজ আমার মনে হয় এখানে একটু অন্যরকম এক্সপিরিয়েন্স হবে। তো আমার জ্যাঠা বললেন যে চল, তো গেলাম ওখানে, গিয়ে দেখি ওখানে লোকে পুরো ঢাকা থেকে টেম্পো করে সবাই এক একটা ছোট খাটো টেম্পো বা ঐ যেগুলো সি এন জি'র যে টেম্পোগুলো সেগুলো নিয়ে সবাই এসছে। এবার যারা কিনছে তাদের মধ্যে মার্সিডিজ নিয়েও লোক এসছে আবার বাসে করেও লোক এসছে। ইটস্ লাইক আ ফিল্ড ক্যাটেল ফেয়ার যেখানে সবাই গরুকে ধরে টরে এদিক ওদিক চেপে টেপে দাম ঠিক করছে। দোকানের লোক বলছে যে এটা ইন্ডিয়ার গরু, এটার দাম এক লক্ষ টাকা। তো ওখানে দরদাম হচ্ছে যে ৮৫-র বেশি দেবনা। তো আল্টিমেটলি ৯০-তে রফা হচ্ছে। সেই গরুটাকে টেম্পোতে তুলে দিয়ে ওনারা বললেন যে ঠিক আছে তাহলে আমরা বলে ওনারা মার্সিডিজে করে যিনি কিনলেন উনি বেরিয়ে চলে গেলেন। সে টেম্পোতে করে পরে গরু গিয়ে পৌঁছল। তো এমনি করে আমরা একটা ফ্যামিলিকে আল্টিমেটলি করলাম যেটা হচ্ছে যে আমার যে জেঠু যেখানে থাকতেন আর কি সেই গ্রামের, সেটা সাভারের কাছেই, সেই গ্রামের মানে তাদের পাশের বাড়িতেই ওনারা থাকেন, তো তাদের সাথে আমাদের দেখা হলো। তো আমার জেঠু ওনাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি, কিনসো? উনি বললেন কিনসি। এক লক্ষ দশ।" "তালে তো ভালো মাল পাইসো।" "পাইসি তো।" "দেখাও কিরকম।" তো দেখলাম একটা লাল বেশ বড় কি বলব, কোয়াইট ওয়েল এনডাওড একটা গরু উনি কিনেছেন এবং সেটা পর দিনকে নিয়ে যাওয়া হলো এবং ঈদ এর

দিনকে পেছনে বাড়ির পেছনে প্লাসটিক পেতে আর কি ওটাকে হালাল করা হবে। তো এই ব্যাপারগুলো মানে আমি শুধু বাংলাদেশ ছাড়াও অনান্য যেকোনো যে সমস্ত দেশে গেছি সে সমস্ত দেশে গিয়ে কোনো না কোনো জায়গায় এরকম কোনো না কোনো ইভেন্ট দেখেছি যেগুলো মানে, ইটস্ ভেরি ইন্টারেস্টিং। মানে আমার সাথে তার কোনো রিলেসন নেই, বাট মানে অল দিজ কালচারাল প্র্যাকটিস, সেটা বাংলাদেশেও যেরকম এক টাইপের কালচারাল প্র্যাকটিস, যেটা আমার সাথে কোনোরকম মেলেনা, অনান্য দেশেও আছে, ইটস্ নাথিং ডিফারেন্ট দ্যাট ওয়ে।

দিশা : আর তুমি কি চাইবে যে তোমার এই স্মৃতিগুলো, তোমার ঠাকুমা ঠাকুরদা বা অন্য ফ্যামিলি মেম্বারদের থেকে যেগুলো পেয়েছ, সেগুলোকে তোমার পরবর্তী প্রজন্মকে পাস অন করতে?

শান : হ্যাঁ সে তো বটেই, বিকজ মানে, হিস্ট্রি যেটাকে আমরা কনভেনসনালি পড়ি সেটা একটা খুব ন্যারো আর কি, সেটা একটা খুব ন্যারো স্পেকট্রামকে ধরে। ভার্নাকুলার হিস্ট্রি যেটা মানে আমার ঠাকুরদার ছবি নিয়ে আমি যখন কাজ করছিলাম তখন আমি দেখছিলাম যে এখন মানে এখন ফটোগ্রাফির দিক থেকে রিসেন্ট ট্রেন্ড হচ্ছে যে ভার্নাকুলার ফটোগ্রাফিকে রিপ্রোডিউস করে বা রিপাবলিশ করে সেটা থেকে একটা ডিসকোর্স ক্রিয়েট করা। তো সেটার জন্য, এই মানে সেটা ওরাল হিস্ট্রিই হোক, রিটন হোক, লিটারেচার হোক, ফটোগ্রাফি হোক, তাদের মুখে বলে যাওয়া কথা হোক, ফ্যামিলিতে শোনা গল্প হোক, এই তার এই ভার্নাকুলার অ্যাসপেক্টটা যদি নেক্সট জেনারেশন জানতে পারে দেন দে শুড বি মানে, দ্য চান্সেস অফ দেম রিলেটিং টু অল ডিস উইল বি মাচ হায়ার।

দিশা : আর কোনো স্পেসিফিক গল্প আছে যেগুলো তুমি পাস অন করতে চাও?

শান : স্পেসিফিক, এই স্পেসিফিক গল্প নিয়ে বলতে গেলে যেটা বলতে হয় যে আমি একটা জিনিস আমি একটা জিনিস এইটা ফার্স্ট দু'বছর ধরে করতে গিয়ে বুঝলাম যে যতই

আমার গল্পটা একটা ফ্যামিলির গল্প হোক না কেন, বাট এই মানে এরকম প্রচুর ফ্যামিলি, এবং সবাই আর কি মোটামুটি ঘুরে ফিরে একই গল্প তাদের সবার কোনো কোনো জায়গায় একটু তফাত হয়, কোনো, সেটা ট্রাইভায়ালিটিস, বাট আল্টিমেটলি উই আর গোইং থ্রু দ্য সেম থিং ।

© 2016 Goethe-Institut e.V.– all rights reserved